যুগান্তর

তারিখ 20 APR 2014
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২...

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নিয়ে রাজনীতি

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার

> সরকার হয়তো চাইছে, ছাত্রলীগ যেন এমন কিছু না করে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের কর্মকাণ্ডে সরকারি ইচ্ছার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সে কারণে সরকার হয়তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পুরনো উদ্যোগটি আলোচনার টেবিলে এনে ছাত্রলীগকে এ মেসেজ দিতে চাইছে যে— অনেক করেছ, আর নয়। আমাদের আর বিপদে ফেলার চেষ্টা কর না।

জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র রাজনীতির জোরালো প্রভাব বাংলাদেশী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে ছাত্ররা রাজনীতিতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে না। পাকিস্তান আমল থেকেই এ দেশের অধিকার সচেতন ছাত্ররা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বাধীনতাযুদ্ধেও ছাত্রসমাজ পালন করেছিল অকুতোভয় ভূমিকা। তবে পাকিস্তান আমলে ছাত্রদের রাজনীতি ও আন্দোলন করার মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং অধিকার সচেতনতা ছিল। ওই সময় ছাত্র রাজনীতিতে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের দূষণ লক্ষিত হয়নি। সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররাই নেতৃত্বে আসতেন এবং তারা সমাজে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতেন। ব্যক্তিস্বার্থ বা আর্থিক সুবিধার জন্য কেউ ছাত্র রাজনীতি করতেন না। বহুল পরিচিত 'চার খলিফা' (নূরে আলম সিদ্দিকী, আসম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন) থেকে শুরু করে তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন এবং ওই সময়ের অন্য সব জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ছাত্রনেতারাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার রাজনীতি করতেন। নিয়মিত ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতো এবং জনপ্রিয় ছাত্রনেতারা নির্বাচিত হয়ে ছাত্রসমাজের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে একেকজন ছাত্রনেতা তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ে তোলার পর জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দিতেন। ছাত্র রাজনীতির ওই গৌরবোজ্জ্বল সময়ে কেউ এ রাজনীতির সমালোচনা করতেন না। পরিবর্তে ভাবতেন, ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে যোগ্য নেতা তৈরি হয়ে পরে তারা জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখবেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির এ গৌরবোজ্জ্বল ধারা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে যেভাবে স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের দূষণ ছড়িয়ে পড়ে, একইভাবে ছাত্র রাজনীতিও হয়ে পড়ে কলুষিত। যুক্তির পরিবর্তে ছাত্র রাজনীতিতে শক্তি প্রয়োগের চর্চা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। মেধাবীদের পরিবর্তে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আসতে থাকে ক্যাডার, মাস্তান এবং বিবাহিত ছাত্ররা। ছাত্রনেতারা ক্রমান্বয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং ভর্তিবাণিজ্যের মতো অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়েন। এ অশুভ ধারা সম্প্রতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একজন ঠিকাদার ছাত্রনেতাদের চাঁদা না দিয়ে নির্মাণ কাজ করতে পারেন না। ছাত্র রাজনীতিতে এখন ত্যাগের চেয়ে ভোগের মনোভাব অধিক প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রনেতাদের এখন গাড়ি চড়ে ক্যাম্পাসে আসার এবং হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে করার উদাহরণ রয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রনেতারা ছাত্রদের একাডেমিক স্বার্থ রক্ষার রাজনীতি করেন না। তারা বড় বড় রাজনৈতিক দলের নির্দেশনা অনুযায়ী ওইসব দলের লেজুড়বৃত্তি করেন। ফলে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িতরা এখন কদাচিৎ ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা বা অধিকার আদায়ে আন্দোলন করেন। পরিবর্তে তাদের দেখা যায় মুরুব্বি রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষায় রাজপথে নামতে। ফলে জাতীয় রাজনীতির সব রকম নেতিবাচকতা ছাত্র রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক সংঘর্ষ, হল দখল, সিট দখল, বন্দুকযুদ্ধ এবং হত্যার রাজনীতি। ক্যাম্পাসে লাশ পড়া এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়া এখন শিক্ষাঙ্গনে পরিচিত ঘটনা। নিজ দলসমর্থিত ছাত্র সংগঠনের বিজয়ের নিশ্চয়তা না পেলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে রাখা স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সামরিক সরকার আমলে ডাকসু নির্বাচন হলেও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আমলে আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় ছাত্র রাজনীতি অধিকতর কলুষিত হয়ে পড়ছে। উল্লেখ্য, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ছাত্রদের আচরণ ভালো হয়। কারণ, ছাত্রনেতারা নির্বাচনে জেতার জন্য ছাত্রদের ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু নির্বাচন না হলে ছাত্রনেতারা সাধারণ ছাত্রদের সমাদর করেন না। তখন তারা যা খুশি তাই করেন। ফলে ছাত্র রাজনীতি আরও কলুষিত ও সহিংসতাময় হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে সাধারণত ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় না। তবে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কখনও আলোচনা হলে সে আলোচনায় সরকারি দলের আগ্রহ থাকলেও বিরোধী দলের আগ্রহ থাকে না। কারণ, বিরোধী দল সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে সব সময় ছাত্রদের ব্যবহার করে। এর মধ্যে সাধারণত দুই রকম সময়ে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমত সরকারি দলসমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড করার মধ্য দিয়ে যখন ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়ত যখন ছাত্র সংগঠনগুলোর সহিংসতায় শিক্ষাঙ্গনে লাশ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থা দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে এ দেশে একাধিকবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হলেও আজ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আলোচনা শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় ব্যালট বাক্স ছিনতাই হলে নির্বাচনের পরদিন ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হয়, 'গতকল্য ডাকসু ও হল নির্বাচনে হেরে গিয়ে ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে সচকিত হইয়া ওঠে। রোকেয়া হল ও সামসুন নাহার হল ব্যতীত অধিকাংশ হলের ব্যালট বাক্স অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়।' এর দুদিন পর পাঁচ খুনের এবং তার ছয় মাস পর মহসীন হলের বহুল আলোচিত সেভেন মার্ডার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিকে অধিকতর অন্তর্মুখী ও সাংঘর্ষিক করে তোলে। ছাত্র রাজনীতির এ সহিংস রূপ দেখে সাধারণ মানুষ এ রাজনীতির ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। তখন থেকে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাশ পড়লে বা ক্যাম্পাস সহিংসতাময় হয়ে উঠলে সরকার কর্তৃক একাধিকবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এরশাদ শাসনামলে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত রাখার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ হ্রাস এবং ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রের রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পাস করা হলেও শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। পরে ১৯৮৯ সালের ২৬ নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের আরেক সিদ্ধান্তে রাজনীতিমুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান প্রদানের ... ত্র অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এরশাদ জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করতে না পেরে এবং ছাত্রদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরানোর লক্ষ্য নিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন। এ প্রস্তাবে কোনো দেশপ্রেম ছিল না। সে কারণে তার ওই প্রস্তাব বৃহৎ রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। পরে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবটি অন্য রকম ছিল। কারণ, ২০০২ সালে এ প্রস্তাব দেয়ার সময় জোট সরকারের প্রধান দুই শরিক বিএনপি ও জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিক্ষাঙ্গনে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। জোট সরকারের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ২০০২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'যাদের ছাত্রত্ব ছিল না তারা ছাত্র রাজনীতির কী বুঝবে? তারা তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চাইবেই। তাদের একজন এইট পাস আরেক জন আইএ পাস, আর একজন রাজপুত্র আসছেন তিনিও আই পাসের ওপর যাননি।' বিরোধীদলীয় নেতার এ আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া ওই সময় পত্রপত্রিকায় সমালোচিত হয়।

প্রায় ২৮ বছর আগে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা স্থগিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে সম্প্রতি উদ্যোগ নেয় মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ দুই বৈঠকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা স্থগিত করার বিষয়টিকে 'স্পর্শকাতর' বিবেচনা করে এখনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনাগ্রহ প্রকাশ করে বিষয়টিকে মন্ত্রিপরিষদে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত দুটি বৈঠকে সংশ্লিষ্ট আলোচকরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগকে একটি বিশেষ সময়ের সিদ্ধান্ত মনে করে ওই সিদ্ধান্ত বর্তমানে প্রযোজ্য কি-না তা নিয়ে পুনর্ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেন। আরপিওতে ছাত্র রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করা এবং রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন না রাখার বিষয়ও আলোচনা হয়। আলোচকরা মনে করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ রকম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে আসা উচিত।

সুশীল সমাজে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ২৮ বছর আগের সামরিক সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে হঠাৎ সরকারের মাথা ঘামানোর কারণ কী? আমাদের পর্যবেক্ষণে মনে হয়, এর পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হল, সরকারি দলসমর্থিত ছাত্র সংগঠনের সাম্প্রতিক বাড়াবাড়িতে সরকার বিব্রত ও অতিষ্ঠ। এমন কোনো দিন নেই যে, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। ছাত্রনেতাদের সন্ত্রাস ও প্রকাশ্য অস্ত্রবাজির ছবি হরহামেশা পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, যা সরকারকে বিব্রত করছে। ছাত্রলীগ নেতারা ক্যাম্পাসে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। মহাজোট সরকারের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ছাত্রলীগের এ বাড়াবাড়ি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বুদ্ধকরণ বক্তৃতা, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদ থেকে তার সরে আসা এবং নানাভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও ছাত্রলীগের অপতৎপরতা কমছে না। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার, হল দখল, সিট দখল, ছাত্রলীগ না করলে হলে থাকতে না দেয়া, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, নিয়োগ এবং ভর্তিবাণিজ্যসহ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নানাবিধ অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে ওবায়দুল কাদের একবার হোমিওপ্যাথি বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্তে ছাত্রলীগের সার্জারির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। ছাত্রনেতারা সিলেটের মদন মোহন কলেজের ৭০ লাখ টাকা মেরে দেয়ায় ওই কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী ছাত্রনেতাদের 'বদমাশ' বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। অতি সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধ এবং বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের সশস্ত্র আক্রমণের সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বজিতের ঘটনায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল, এ ঘটনায় আমাদের নাক-কান কাটা গেল' (প্রথম আলো, ০৩.০২.১৪)।

সরকারের জনপ্রিয়তা এমনিতেই নিম্নমুখী। সহিংসতাময় ও কেন্দ্র দখলের উপজেলা নির্বাচনের পর সরকারের গ্রহণযোগ্যতা আরও হুমকিযুক্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সরকার নিজের ভেঙে পড়া যৌক্তিক ও নৈতিক বৈধতা বিনির্মাণ ও অস্তিত্ব নিয়ে ভাববে, নাকি ছাত্রলীগের অপকর্ম রোধে মনোযোগ দেবে। কাজেই সরকার হয়তো চাইছে, ছাত্রলীগ যেন এমন কিছু না করে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের কর্মকাণ্ডে সরকারি ইচ্ছার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সে কারণে সরকার হয়তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পুরনো উদ্যোগটি আলোচনার টেবিলে এনে ছাত্রলীগকে এ মেসেজ দিতে চাইছে যে— অনেক করেছ, আর নয়। আমাদের আর বিপদে ফেলার চেষ্টা করো না। এরপরও যদি সরকারকে বিপদে ফেলার মতো কাজ কর, তাহলে আমরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পুরনো প্রস্তাব বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে বাধ্য হব। অপেক্ষা করে দেখা যাক, সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা এ মেসেজ পাওয়ার পর তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডকে গঠনমূলক করে তুলতে পারেন কি-না।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
akhtermy@gmail.com